দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষার মান ও কারিকুল্যাম

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর এক মূল্যায়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রণীত কারিকুল্যামে যেসব পাঠ্যবই আছে তা ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী নয়। এ সকল বই তাদের কাছে গ্রহণীয় হয়নি। ৫ বছর পড়াশুনার পর ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মান যে স্তরে পৌঁছার কথা তাও পৌঁছানো যাচ্ছে না। মাত্র ৩ দশমিক ৭ শতাংশ শিক্ষার্থী এ থেকে উপকৃত হচ্ছে। রিপোর্টে আরো বলা হয় ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে কারিকুল্যাম আছে ৭০ শতাংশ শিক্ষকই তা বোঝেন না। ফলে তারা ছাত্রছাত্রীদেরও পড়াতে পারছেন না।

বিআইডিএস-এর মূল্যায়ন রিপোর্ট থেকে দেশে প্রাথমিক তথা শিক্ষার সার্বিক মান সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়। পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো সরকার ক্ষমতায় এসেছে প্রায় সবাই নিজেদের শিক্ষানুরাগী প্রমাণ করতে একটি করে শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন, স্কুলের কারিকুল্যাম ও পাঠ্যবই বদলে নতুন করে লিখিয়েছেন। এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা লাভবান না হলেও সরকারের সমর্থক পাঠ্যবই লিখিয়েরা লাভবান হয়েছেন। আর বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে অল্প বয়সী ছাত্রছাত্রীরা।

স্বাধীনতার পর শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করার লক্ষ্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন না আনলেও স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি গণমুখী ও বাস্তবানুগ শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছিল। পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত দেশে যতগুলো শিক্ষা কমিশন হয়েছে কুদরত-ই-খুদা কমিশনই সবচেয়ে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা চালুর প্রয়াস নিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়িত হয়নি। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রত্যেক সামরিক শাসকই কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অগ্রাহ্য করে নতুন নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করে রাজনৈতিক ফায়দা লাভে সচেষ্ট হন। কিন্তু কোন সরকারই কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল করেননি।

গত বছর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন এবং এই উপলক্ষে জাতীয় শিক্ষানীতি সংক্রান্ত ৬০ সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করেন। এই কমিটি বর্তমানে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। বিআইডিএস-এর মূল্যায়ন রিপোর্টে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কারিকুল্যাম, পাঠ্যবই এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির যেসব দুর্বলতা চিহ্নিত করেছে আশা করব জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি সেগুলো সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন—কেবল ১৯৯২ সালে প্রণীত কারিকুল্যামেই নয় আমাদের শিক্ষার সকলস্তরে সকল কারিকুল্যামেই মস্তবড় গলদ রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চলছে তুঘলকী কাণ্ড। একেকজন সামরিক শাসক ক্ষমতায় এসে তার খেয়ালখুশিমত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ওপর নতুন নতুন ভাষা ও বিষয় চাপিয়ে দেন। এ জন্য কোন কমিটির প্রয়োজন নেই। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শের দরকার নেই। একটি অধ্যাদেশ জারি হলেই হলো। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন শিক্ষার্থীর ওপর মাতৃভাষা ছাড়াও বাড়তি দু'টি ভাষা (আরবি ও ইংরেজি) চাপিয়ে দেয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে কি?

এছাড়া আছে পাঠ্যবই প্রণয়নের সমস্যা। দেশের খ্যাতনামা লেখক-শিক্ষাবিদদের দিয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন না করিয়ে রাজনৈতিক সমর্থক ও পছন্দমত লেখকদের দিয়ে লেখালে তাতে ভাষাগত ও বিষয়গত দুর্বলতা থাকবেই। এ নিয়ে কাউকে কোথাও জবাবদিহিতা পর্যন্ত করতে হয় না। ফলে পাঠ্যবইয়ের নামে স্কুলে শিশু শিক্ষার্থীদের যা গলাধকরণ করানো হচ্ছে প্রায়শ তা বদহজমে পরিণত হয়। বিআইডিএস-এর মূল্যায়ন রিপোর্টে সেই অপ্রিয় সত্যটাই প্রতিফলিত হয়েছে। তবে কারিকুল্যাম বা পাঠ্যবই সহজ করার নামে যেন এমন কিছু করা না হয় যাতে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাছাড়া শুধু কারিকুল্যাম বদলিয়ে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মান বাড়ানো যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন এবং এ পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করা। 'যার নেই কোন গতি' সেই ধরনের শিক্ষকদের দিয়ে আর যাই হোক প্রাথমিক শিক্ষার মান পরিবর্তন করা যাবে না।